হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

Vol. No. 1, Issue No. 7, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 1.00, June 2011

উচ্ছৃঙ্খল হওয়া বা লাম্পট্য লীলার সমর্থন গীতা করেন না। আজকাল গীতা, বাইবেল ও কোরাণের সাম্য করিবার একটা কুবুদ্ধি দেখা দিয়াছে। পাঠক জানিয়া রাখুন, ভোগবাদ ও শক্তিবাদ এক নহে। হুর লাভ, নির্ব্বাণ লাভ ও মোক্ষ লাভ কি এক? লাম্পট্যবাদ ও নির্ব্বাণে কি ভেদ নাই?

— স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী
(শক্তিবাদ প্রবর্তক)

হিন্দুর গলায় ছুরি বসানোর আইন করছে কেন্দ্রীয় সরকার

গজনীর মামুদ ও আওরঙ্গজেবের উপরে মনমোহন সিং-য়ের নাম বসবে

হিন্দু বিরোধিতার সমস্ত সীমা পার করে যাচ্ছে সোনিয়া মনমোহন পরিচালিত কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার। তারা সংসদে এমন একটা আইন পাশ করতে চলেছে, যার ফলে মনে হবে যে ভারতে হিন্দু হয়ে জন্মগ্রহণ করাটাই যেন অপরাধ। আইনটির নাম ''প্রিভেনশন অফ কম্যুনাল এন্ড টারগেটেড ভায়োলেন্স বিল-২০১১'' (Prevention of Communal and Targeted Violance Bill, 2010)।

এই আইনের মূল কথা হল —দেশের কোথাও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগলে তার জন্য শুধু হিন্দুদেরকেই দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি দেওয়া হবে, কারণ হিন্দুরা এদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই আইন অনুসারে ধরেই নেওয়া হয়েছে যে, কোন সংখ্যালঘু গোষ্ঠী, অর্থাৎ মুসলমান বা খ্রীষ্টানরা হিন্দুর উপর আক্রমণ করতেই পারে না। এই প্রস্তাবিত আইনে আরও বলা হয়েছে যে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধলে কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকারের তোয়াক্কা না করে সেই স্থানে কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠিয়ে দিতে পারবে। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে ভারতের সংবিধান অনুসারে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা রাজ্যের এক্তিয়ারে। কেন্দ্রের এক্তিয়ারে নয়। তাই রাজ্য সরকার না ডাকলে কেন্দ্র কোথাও তার বাহিনী পাঠাতে পারে না। কোন রাজ্যে আইনের শাসন সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়লে অথবা সংবিধানের পালন না হলে রাজ্যপালের পরামর্শক্রমে কেন্দ্র সংবিধানের ৩৫৬ নং ধারা প্রয়োগ করে সেই রাজ্য সরকারকে ভেঙ্গে দিয়ে রাষ্ট্রপতি শাসন জারী করতে পারে, এবং তারপর কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠাতে পারে। কিন্তু সংসদে এই নতুন আইনটি পাশ হলে রাষ্ট্রপতি শাসন জারী না করে এবং রাজ্য সরকারের অনুমতি না নিয়েই কেন্দ্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দমনের অজুহাতে তার বাহিনী, অর্থাৎ সি.আর.পি.এফ, সি. আই. এস. এফ. প্রভৃতি আধা সামরিক বাহিনী পাঠিয়ে দেবে। এটা হল ভারতীয় সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর উপর কুঠারঘাত।

এই প্রস্তাবিত আইনের ৭ নং ধারায় বলা হয়েছে যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মহিলার উপর যৌন অত্যাচার কেউ করলে তা হবে অপরাধ। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মহিলার উপর যৌন অত্যাচার হলে তা এই অপরাধের আওতায় পড়বে না। ৮ নং ধারায় বলা হয়েছে— বক্তব্য, লেখা অথবা ভিডিও প্রদর্শনের মাধ্যমে সংখ্যালঘু গোষ্ঠী বা সেই গোষ্ঠীর কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রচার করলে তা হবে অপরাধ। কিন্তু, হিন্দুর বিরুদ্ধে কেউ ঘৃণা প্রচার করলে তা অপরাধের তালিকায় পড়বে না। ১০ নং ধারায় আছে — সংখ্যালঘুর বিরুদ্ধে কোন কাজে কেউ অর্থ সাহায্য করলে তা অপরাধ, কিন্তু হিন্দুর বিরুদ্ধে কেউ অর্থ সাহায্য করলে তা অপরাধ নয়। সংখ্যালঘুর উপর কোন সরকারী কর্মচারী অত্যাচার করলে ১২ নং ধারায় তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সংখ্যালঘুকে রক্ষার কাজে গাফিলতি করলে সরকারী কর্মচারী ও পুলিশ অফিসারের শাস্তি হবে ১৩ ও ১৪ নং ধারায়।

আর এই আইনের ১৫ নং ধারা আরও ভয়ংকর। সংখ্যালঘুর উপর অত্যাচারকারী কোন ব্যক্তি যদি কোন সংস্থার সদস্য হয়, তাহলে সেই সংস্থার যে কোন পদাধিকারী এবং বরিষ্ঠ সদস্যকেও এই ১৫ নং ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি দেওয়া হবে। ১৬ নং ধারায় বলা হয়েছে — যদি উক্ত সংস্থার কর্তাব্যক্তিরা যদি সংস্থার সদস্যকে সংখ্যালঘুর উপর কোনরকম অত্যাচার না করার আদেশও দিয়ে থাকেন, কিন্তু সদস্য যদি সেই আদেশ লঙ্ঘন করে, তাহলেও ওই পদাধিকারী দোষী সাব্যস্ত হবেন এবং তার শাস্তি হবে।

এই আইন পাশ হলে কাশ্মীরের ৬ টি জেলায় যেখানে মুসলমান ৯৮ শতাংশ, হিন্দু ১ শতাংশ, সেখানে হিন্দুর উপর মুসলিমদের কোন অত্যাচার হলে তা এই আইনের আওতায় পড়বে না। কারণ, এই আইনের সংজ্ঞা অনুসারে সেখানে ওই ১ শতাংশ হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ, আর ৯৮ শতাংশ মুসলমান হচ্ছে সংখ্যালঘু। সুতরাং, ইয়াসিন মালিক, গিলানী, মুফ্‌তি সঈদরা হিন্দুর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য উস্কানি দিয়েও, প্রচণ্ড ঘৃণা প্রচার করেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা করতে টাকা সাপ্লাই করেও এই আইনের আওতার বাইরে থেকে যাবে। আর হিন্দুর আত্মরক্ষার কাজ করে জেলে যেতে হবে তপন ঘোষ, প্রমোদ মুতালিকদের।

সোনিয়া গান্ধীর বাছাই করা একটি কমিটি, যার নাম জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদ, এই আইনের খসড়াটি তৈরী করেছেন। সংসদে এটি পেশ করা হবে। তারপর ভারতের হিন্দুর ভাগ্যে কী আছে কে জানে। আইনটি পাশ হলে হিন্দুর গলায় ছুরি বসবে। আর গজনীর মামুদ ও আওরঙ্গজেবের উপরে মনমোহন সিং-য়ের নাম বসবে।

উত্তরবঙ্গে হিন্দু সংহতির যাত্রা শুরু

অনেকদিন ধরেই উত্তরবঙ্গে বিছিন্ন ভাবে যোগাযোগ বা কাজকর্ম চলছিল। মালদহের কালিয়াচক তথা অন্যান্য জায়গাতেও যোগাযোগ ও মিটিং হয়েছে। ২২ মে গাজোল বয়েজ হাইস্কুলে মালদহের গাজোল, রতুয়া ও উত্তর দিনাজপুরের ইটাহার ব্লক থেকে প্রায় ২৫০ কর্মীদের নিয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন হিন্দু সংহতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শ্রী তপন কুমার ঘোষ। সভাপতিত্ব করেন নরসিংহ প্রসাদ গুপ্ত, বিশিষ্ট সামাজসেবী ও গাজোল ব্লকের ভারত স্বাভিমান ট্রাস্ট্রের সভাপতি। এছাড়া সভায় উপস্থিত ছিলেন নদীয়া ভারতমাতা মন্দিরের সাধ্বী স্মৃতি দেবী। শ্রী ঘোষ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে উত্তর এবং দক্ষিণ দুইবঙ্গের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে ইসলামের ভয়াবহতা সকলের সামনে তুলে ধরেন। ইতিমধ্যে মালদহ জেলা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলায় পরিণত হয়েছে। ফলে উপস্থিত সকলে এই বক্তব্যের সমর্থন করেন। পরে ব্যক্তিগত মত বিনিময়ের সময়ে মালদা জেলার বিভিন্ন ব্লকে হিন্দুরা নিত্যদিন কি পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছেন তা বর্ণনা করেন। পড়ে থাকা দেবোত্তর সম্পত্তি দখল, হিন্দু মেয়েদের শ্লীলতাহানি, এরকমই একটি হাড় হিম করা ঘটনা — আলাল স্কুলের এক মুসলিম শিক্ষক দ্বারা তিনটি হিন্দু ছাত্রীকে তিনবছর ধরে শ্লীলতাহানি ঘটনা সকলের সামনে উঠে আসে। বিভিন্ন ব্লক থেকে আসা কর্মীরা অনেকে নতুন ছিল, তারা তাদের এলাকাতে ফিরে হিন্দু সংহতির কাজ করার সংকল্প গ্রহণ করেন। তারা এই সকল ঘটনা শুনে অঙ্গীকারবদ্ধ হন যে, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকার নারীর সম্মান ও নিজের পায়ের তলার মাটি বাঁচানোর জন্য হিন্দু সংহতির কর্মধারাকে সর্বস্তরে পৌঁছে দেবেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে সুজিত মাইতি উত্তরবঙ্গের যোগাযোগ রক্ষা করছেন।

খালধারও দখল হচ্ছে

বিশেষজ্ঞদের কথানুসারে, ভূ-জলস্তর যেভাবে দ্রুত নেমে যাচ্ছে, তার ফলে যেমন প্রাকৃতিক বিপর্যয় (যেমন ভূমিকম্প) ঘটতে পারে, ঠিক তেমনি চাষ বা পানীয় জলের হাহাকার বাড়বে। ফলে এর প্রতিকার হিসাবে যখন সরকার খাল, নালা, পুকুর এবং বিভিন্ন জলাশয় খনন করতে চলেছে যাতে বর্ষা বা নদীর জল ধরে রাখা যায়, ঠিক তখনই প্রশাসনিক উদাসীনতা, দায়িত্বশীল আধিকারিকের নিস্ক্রিয়তার ফলে, একের পর এক খাল এবং নদীর চর জবরদখলকারীরা বেআইনিভাবে গায়ের জোরে দখল করছে।

উদাহরণ-দঃ ২৪ পরগনা জেলার , ১) মগরাহাট ব্লকের বিভিন্ন প্রধান এবং শাখা খাল গুলি। ২) মন্দিরবাজার ব্লকের বিভিন্ন খাল, ৩) সুন্দরবন অঞ্চলের বিভিন্ন নদীর চর, যেমন পিয়ালী নদী (কেল্লা-মহিষমারী), ৪) পিয়ালী খাল আজ প্রায় বুজেই গিয়েছে। এরকম বহু উদাহরণ আছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মগরাহাট বিডিও এবং ব্লক সেচ দপ্তরের নিকট এলাকার মানুষ কিছুদিন আগেই গণ স্মারকলিপি দেন, ১) বাকিঁপুর দিয়ে যে খাল গিয়েছে, ২) মগরাহাট থেকে ধনপোতা, ৩) মগরাহাট থেকে নৈনান, ৪) চাকদা থেকে ঝিন্‌কী, প্রভৃতি খাল থেকে দখলকারীদের উচ্ছেদ এবং তাদের বিরুদ্ধে আইনানুযায়ী মামলা করার জন্য।

কিন্তু, অধিকাংশ জবরদখলকারী মুসলমান সম্প্রদায়ের, তাই প্রশাসন নীরব এবং মুসলমান তোষণকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারাও তাদের এই বেআইনি কাজকে প্রশয় দিতে বরদহস্ত।

আমাদের কথা

পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের ফল

পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, কেরল, তামিলনাড়ু ও পন্ডিচেরী পাঁচটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম তিনটি রাজ্যে কংগ্রেস জোট ক্ষমতায় এসেছে। তামিলনাড়ুতে জয়ললিতা। পন্ডিচেরীতে একটি স্থানীয় দল। পশ্চিমবঙ্গের ফলাফল সম্পূর্ণ প্রত্যাশিত ছিল। বিগত পঞ্চায়েত, লোকসভা ও পৌরসভা নির্বাচনগুলিতে সিপিএম হেরেছিল। এবার তাদের পরাজয় সম্পূর্ণ হল। পাপের ঘড়া পূর্ণ হল। মমতা ব্যানার্জ্জী তার অনমনীয় সংগ্রামের সুফল পেলেন। তিনি আজ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। আর বিজেপি-র ভোট ৬ থেকে কমে ৪ শতাংশ হল।

এই ফলাফল থেকে একটি বিষয়ের প্রতি আমরা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। যদি এদেশে গণতন্ত্র না থাকত, তাহলে আমরা ৩৪ বছর পরেও সিপিএমের অপশাসন থেকে মুক্তি পেতাম কি? তাই, সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যারা হাত মিলিয়েছেন, তাঁরা স্বাগত। কিন্তু এই হাত মেলানো ভিড়ের মধ্যে অন্ততঃ দুটি গোষ্ঠী/শক্তি আছে যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না। একটি শরীয়তে বিশ্বাসী ইসলামিক শক্তি, অপরটি মার্কসবাদে বিশ্বাসী মাওবাদী শক্তি। আমরা সাধারণ মানুষকে সাবধান করে দিতে চাই যে এরা যদি মমতার সযত্ন ছায়ায় শ্রীবৃদ্ধি করে কোন সময় ক্ষমতা দখল করে, তখন তাদের আদর্শ অনুসারেই তারা মার্কসবাদী বা মাওবাদী একনায়কতন্ত্র অথবা মধ্যযুগীয় বর্বর শরীয়ত রাজ স্থাপন করবে। এই দুটি আদর্শেই সাধারণ মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতা নেই। তাই তখন আর ভোট দিয়ে বা আন্দোলন করে মানুষ এদের স্বৈরতন্ত্র থেকে মুক্তি পাবে না। তখন একমাত্র পথ থাকবে রক্তাক্ত বিপ্লব। তাই এই দুটি গণতন্ত্রবিরোধী শক্তির প্রতি সাবধান হওয়া দরকার।

এই পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনের মধ্যে আসাম ও কেরলের ফলাফলের একটু বিশেষ পর্যালোচনা করা দরকার। আসামে মুসলিম তোষণকারী পার্টি হিসাবে কংগ্রেস চিরকালই মুসলিম ভোট পেয়ে এসেছে। প্রকৃতপক্ষে তাদের এই সর্বনাশা তোষণনীতির প্রতিক্রিয়াতেই তৈরী হয়েছিল আসু ও পরে অগপ। অগপ আসামে ক্ষমতা দখলও করেছিল। কংগ্রেসের মুসলিম অনুপ্রবেশকারী তোষণনীতির বিরুদ্ধে জোট বেঁধে অগপ বিজেপি লোকসভায় ভাল আসনও পেয়েছিল। মূলতঃ অসমীয়ভাষী হিন্দুর ভোট পেত অগপ, আর বিজেপি পেত বাংলাভাষী হিন্দুর ভোট, যার মধ্যে ৯৯ শতাংশই পূর্ব পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে আগত উদ্বাস্তু। এই দুটি হিন্দু ভোট যোগ হয়ে ওই জোটের ফল ভাল হত। অন্যদিকে কংগ্রেসের সলিড ভোট ব্যাঙ্ক ছিল মুসলমান। এবার নির্বাচনে হোজাই এর বিখ্যাত আতর ব্যবসায়ী বদরুদ্দিন আজমলের তৈরী দল এ.ইউ.ডি.এফ. ৩১টি আসনে প্রার্থী দিয়ে ১৮ টি আসনে জয়ী হয়েছে। এটা তাদের দ্বিতীয় নির্বাচন। অসাধারণ সাফল্য। আসামের মুসলিম ভোট ৩০ শতাংশের বেশী। এর অধিকাংশটাই টেনে নিল এ.ইউ.ডি.এফ। তাহলে কংগ্রেসের তো বিরাটভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার কথা। সেই কংগ্রেসের আসন সংখ্যা গতবার ৫৩ থেকে বেড়ে এবার ৭৮ হয়ে গেল। কি করে হল? এটা কি অত্যন্ত আশ্চর্যের ঘটনা নয়? এর এককথায় উত্তর- আসামে হিন্দুরা একজোটে অগপ বিজেপিকে পরিত্যাগ করেছে এবং কংগ্রেসকেই ভোট দিয়েছে। তাই, মুসলমানরা ছেড়ে যাওয়ায় কংগ্রেসের যে ক্ষতি হয়েছে, সেই ক্ষতি পূরণ করে দিয়েও অনেক বেশী লাভ করে দিয়েছে হিন্দু ভোট। কংগ্রেস যা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি, সেই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে এই কোয়ালিশনের যুগেও ১২৬ এর মধ্যে ৭৮।

বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সাধারণ মানুষকে ভুল বোঝানোর চেষ্টা করছে এই বলে যে বিরোধী ঐক্য হয়নি বলে তাদের এই খারাপ ফল। একথা ঠিক নয়। আসামের বহু আসনের ফলের সমীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, অগপ ও বিজেপি-র ভোট যোগ করেও কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোটের সমান হচ্ছে না। সম্পূর্ণ বাঙালি অধ্যুষিত বরাক উপত্যকায় তিনটি জেলা — কাছাড়, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি। এখান থেকেই দীর্ঘদিন লোকসভায় জিতে আসছেন বিজেপি-র কবীন্দ্র পুরকায়স্থ, আর এস এসের প্রবীণ কার্যকর্তা ও প্রাক্তন প্রচারক। এখানে বিজেপি-র পাঁচটি এম এল এ ছিল। এবার শূন্য। এখানে অসমীয়াভাষী মানুষ প্রায় থাকেনা বললেই চলে। তাই এখানে অগপ-র ভোট নেই। সুতরাং জোট না হওয়ায় ভোট কমে যাওয়ার যুক্তিটা এখানে অচল।

এখন প্রশ্ন, আসামে হিন্দুরা অগপ ও বিজেপিকে পরিত্যাগ করল কেন? এককথায় উত্তর — হিন্দুরা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছে যে অগপ ও বিজেপি ক্ষমতার জন্য মুসলিম তোষণের রাস্তায় গিয়েছে। এরাও হিন্দুর বিপদে পাশে দাঁড়ায় না। তাই হিন্দুরা এদেরকে পরিত্যাগ করেছে। তাহলে কংগ্রেস কি হিন্দুর পাশে দাঁড়ায়? আমরা জানি দাঁড়ায় না। কিন্তু আসামের হিন্দু এবার বদরুদ্দিন আজমলের কিং-মেকার হওয়ার স্বপ্নকে ব্যর্থ করতেই একযোগে ঢেলে ভোট দিয়েছে কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈকে। আসামের হিন্দুদের আরচণ থেকে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে তারা তাদের অস্তিত্বের সংকট বুঝতে পেরেছে। উন্নয়ন, বিকাশ আর দুর্নীতি তাদের কাছে ইস্যু নয়। মুসলিম আগ্রাসনের হাত থেকে নিজেদের অস্তিত্বকে রক্ষা করাই তাদের কাছে একমাত্র ইস্যু। এই কথাটিকে বিজেপি-র নেতৃত্ব ঘুলিয়ে দিতে চায়। কারণ, তারাও কংগ্রেসের মত সেকুলার লাইনে হাঁটতে চায়। শুধু সংঘ পরিবার তাদের পিছনে টেনে ধরে 'না ইধার কা না উধার কা' পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন।

অনুরূপভাবে কেরলে যখন কংগ্রেস মুসলিম লীগের সঙ্গে জোট বেঁধেছে এবং ভারত বিভাজনকারী এই মুসলিম লীগ ২০টি আসন পেয়েছে, তখন হিন্দুরা এই বিপদ আগে থেকেই বুঝতে পেরে খুব বড় সংখ্যায় ভোট দিয়েছে সিপিএমকে। অর্থাৎ কেরলেও হিন্দুরা বিজেপিকে তাদের রক্ষাকর্তা হিসাবে ভাবতে পারেনি। এই কারণেই এবার কেরলে কংগ্রেস জোট জিতলেও তাদের মার্জিন খুব কম। সিপিএমের এবার অনেক বেশী ভোটে ও আসনে হারার কথা ছিল। কিন্তু এই হিন্দু ভোট পাওয়ার জন্য তাদের হারের মার্জিনটা অনেক কম হয়েছে।

অথচ বিজেপি তো আজও অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যে রাজত্ব করছে। মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিসগড়, কর্ণাটক, হিমাচল, বিহার ইত্যাদি। সেখানে তো হিন্দুরা ভাল সংখ্যায় বিজেপিকে ভোট দিচ্ছে। তাহলে এই দুরকম চিত্র কেন? যেখানে হিন্দুর অস্তিত্বের সংকট নেই, সেখানে কংগ্রেসের দুর্নীতি ও পরিবারতন্ত্রের বিরুদ্ধে মানুষ বিজেপিকে ভোট দিচ্ছে। কিন্তু যেখানে হিন্দুর অস্তিত্ব ও নিরাপত্তার সংকট, সেখানে মানুষ আর বিজেপিকে ভরসা করতে পারছে না। বিজেপি-র উচ্চ নেতৃত্বও তাই চায়। ক্ষমতা দখলের জন্য তারা কংগ্রেসের দুর্নীতি ও দুঃশাসনের দিকে আশার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। জনসাধারণের মধ্যে হিন্দুত্বের প্রেরণা তৈরী করে সেই ভিত্তির উপর এক মহান গৌরবময় শক্তিশালী রাষ্ট্র নির্মাণের স্বপ্ন বা পরিকল্পনা আজ আর বিজেপি-র নেই। তাই তারা হিন্দুত্বের ইস্যুগুলিকে ছেড়ে দিয়েছে। হিন্দুত্বের ইস্যুই যে রাষ্ট্রীয়ত্বের ভিত্তি, এ বিশ্বাস তাদের আর নেই। তারা খুব সচেতনভাবেই কংগ্রেসের মত তাদের পার্টিকে সর্ব সমাবেশক একটি মঞ্চে পরিবর্তিত করতে চায়। সেই মঞ্চটা এতটাই প্রশস্ত হবে যে সেখানে সাপও থাকবে ব্যাঙও থাকবে; সেকুলারও থাকবে, জেহাদীও থাকবে; সোশালিস্টও থাকবে, আম্বানিরাও থাকবে। এটাই কংগ্রেসের মডেল। এটাই এখন বিজেপির আদর্শ। এটাকে যদি কেউ জগাখিচুড়ি বলে মনে করেন, তাতে অরুণ জেটলি সুষমা স্বরাজদের কপালে একটুও ভাঁজ পড়বে না। পার্টিটা তাঁরাই চালাচ্ছেন। আর সারা দেশে হিন্দুত্ববাদীরা নির্বোধের মত এটাকেই প্রো-হিন্দু পার্টি ভাবছে। আসাম আর কেরলের হিন্দুরা তা ভাবতে পারছে না তাদের অভিজ্ঞতা থেকে।

দিদির নয়া রাজত্বে সংহতির অগ্নিপরীক্ষা

পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতা পরিবতনের পরেই হিন্দু সংহতির কাজের উপরও তার প্রভাব পড়েছে। এই প্রভাব ইতিবাচক নয়, নেতিবাচক। এরকম যে হবে - এ ধারণা আমাদের আগে থেকেই ছিল। তবু এর ধাক্কা সামলাতে আমাদের কর্মীদের অনেক দৃঢ় মানসিকতার পরিচয় দিতে হবে।

জয়নগরে জীবনমন্ডলের হাটে ৫ই জুন হিন্দু সংহতির জনসভা হওয়ার কথা ছিল। থানা প্রশাসন আগে থেকে মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিয়েও শেষে অনুমতি দেয়নি। সভার হ্যান্ডবিল বিলি করা হয়ে গিয়েছিল এবং পোষ্টারও লেগেছিল। তা সত্ত্বেও শেষ মুহূর্তে সভা বাতিল করতে হয়। ফলে স্থানীয় কর্মীরা যথেষ্ট অসুবিধায় পড়ে।

মছলন্দপুরে রাজু নামে একটি মুসলমান ছেলে নাম ভাঁড়িয়ে হিন্দু মেয়েদের সঙ্গে যথেচ্ছভাবে মেলামেশা করত। একটি মেয়ের বাড়ি থেকে অভিযোগ আসায় সংহতি কর্মীরা ছেলেটিকে সাবধান করতে যায়। এই অপরাধে তৃণমূলের কয়েকজন নেতা সংহতির চারজন কর্মীকে আলোচনার জন্য ডেকে নিয়ে গিয়ে প্রচণ্ড মারধর করে এবং হাবরা থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পুলিশ এতদিন সি পিএম-এর কথা শুনেছে। প্রশাসনের নিরপেক্ষতা কাকে বলে তারা জানেনা। তাই এখন তারা তৃণমূলীদের কথা শুনতে বাধ্য। সুতরাং পুলিশ সংহতির ওই চারজন কর্মীর নামে কেস দেয়। পরেরদিন তারা কোর্ট থেকে জামিনে ছাড়া পায়।

মছলন্দপুরে সংহতির একটি পথসভা হওয়ার কথা ছিল। পুলিশ প্রথমে অনুমতি দিয়েও পরে তা বাতিল করে দেয়।

বনগাঁতে একটি হিন্দু মহিলাকে ধর্ষণের প্রচেষ্টার প্রতিবাদ করাতে পুলিশ ৬-৭ টি গ্রামের হিন্দুদেরকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে এবং রাজনৈতিক নেতাদের নির্দেশে হিন্দু সংহতিকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা করছে। এই প্রচণ্ড অত্যাচারের মুখে স্থানীয় হিন্দুরা দিশেহারা। পুরুষেরা আতঙ্কে মাঠে রাত কাটাচ্ছে। তাদের মনে প্রশ্ন, মমতা ব্যানার্জ্জীর শাসন কি পূর্ব পাকিস্তানে ইয়াহিয়া খাঁয়ের রাজত্বের সমান?

স্বরূপনগর থানার চারঘাট ফাঁড়ির অফিসার প্রভাত প্রামাণিকের অত্যাচার চলছেই। হিন্দুদের দেবোত্তর জমিতে ছোট ছোট ছেলেদের খেলতে বাধা দিচ্ছে এই প্রভাত প্রামাণিক।

এদিকে একের পর এক স্থান থেকে হিন্দুদের উপর মুসলমানের অত্যাচারের খবর আসছে। অবশ্য সব অত্যাচারই হচ্ছে রাজনৈতিক ছদ্মবেশে। অত্যাচারের একটা নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছে। দিদি যে বলেছেন, বদলা নয় বদল চাই। তাই নতুন তৃণমূলীরা, বহুক্ষেত্রেই মুসলমান, সিপিএম করা লোকদের কাছে গিয়ে বেশী মারধর না করে বড় অঙ্কের টাকা নিয়ে নিচ্ছে সিপিএম করার জরিমানা হিসাবে। এই ভুক্তভোগীদের প্রায় সবাই হিন্দু। গড়বেতা কেশপুর শালবনিতে সংগৃহীত টাকার পরিমাণ ৭৫ লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছে। আরও বহু স্থান থেকে একই খবর আসছে।

এইসব খবর তৃণমূলের উপর মহলে পৌঁছাচ্ছে কিনা জানা নেই। কিন্তু রাজত্বের শুরু এইভাবে হলে তৃণমূলের জনপ্রিয়তা কমতে আর বেশীদিন লাগবে না। সিপিএম তো সেই আশাতেই বসে আছে। এই পরিস্থিতিতে সংহতি কর্মীদেরকে আরও কিছুদিন ধৈর্য্য ধরে ও দম ধরে থাকতে হবে। আরও কয়েকটা মাস অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে দিয়ে আমাদের যেতে হবে।

বাংলাদেশে মন্দির ধ্বংস ও গীতা পোড়ানো হল

শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা পার্ষদ ছিলেন শ্রীবাস আচার্য্য। পূর্ববঙ্গের শ্রীহট্ট জেলায় তাঁর বাড়ী ছিল। বর্তমানে তা বাংলাদেশের সিলেট জেলার বিয়ানি বাজারে। তাঁর সেই পৈতৃক বাসস্থানের নাম 'শ্রীবাস অঙ্গন'। সারা বিশ্বের বৈষ্ণবদের কাছে এক পবিত্র তীর্থ। গত ২ এপ্রিল সকাল ১০ টার সময় আওয়ামী লীগের মদতপুষ্ট ভূমি মাফিয়া জনাব দি পু শেখ তার বিরাট দলবল নিয়ে শ্রীবাস অঙ্গন আক্রমণ করে। ওই অঙ্গনেই আছে শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, পঞ্চতত্ব মন্দির ও শিব মন্দির। হামলাকারীরা তিনটি মন্দিরেই ভাঙচুর করে এবং অনেক মূর্তি ভেঙ্গে পাশের পুকুরে ফেলে দেয়। শ্রীবাস অঙ্গনের নিত্য সেবা করা সন্ন্যাসী সিদ্ধ গৌরদাস ব্রহ্মচারীকেও তারা হত্যা করার চেষ্টা করে। উক্ত গ্যাং এর সাবুল আলি মুখ্য মন্দিরের দানবাক্স লুট করে নিয়ে যায়।

এই শ্রীবাস অঙ্গনে বহু মূল্যবান প্রাচীন ধর্মীয় পুঁথি আছে। ধর্মান্ধ আক্রমণকারীরা কমপক্ষে ১০ টি গীতা ও অনেক মূল্যবান ধর্মীয় গ্রন্থ পুড়িয়ে দেয়। হামলাকারীদের মূল লক্ষ্য শ্রীবাস অঙ্গনের পাঁচ বিঘা দেবোত্তর সম্পত্তি দখল করা।

ঘটনার পর বিয়ানী বাজারে উত্তজনা ছড়িয়ে পড়ে। কয়েক'শ হিন্দু একত্রিত হয়ে থানায় যায়। বিয়ানী বাজার থানায় হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ১৪৩/৪৪৮/২৯৪/৩২৩/৩৭৯/৩৮০/৫০৬ ধারায় কেস দায়ের করা হয়।

এই ঘটনার প্রতিবাদে গত ১২ এপ্রিল বাংলা দেশের ''মঠ মন্দির ও দেবোত্তর সম্পত্তি রক্ষা সমিতি'' ঢাকায় একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে। সমিতি এই ধরণের ঘটনার জন্য বাংলাদেশের ' শত্রুসম্পত্তি আইন' কেই দায়ী করে। সমিতি একটি প্রেস বিবৃতিতে সমিতি জানায় যে হিন্দুর দেবোত্তর সম্পত্তি দখল করার ঘটনা সারা বাংলাদেশব্যাপী ঘটেই চলেছে। এরকম কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হয় বিবৃতিততে।

১) রাজধানী ঢাকা শহরের সুতারপুর এলাকায় ২২২ নং লালমোহন সাহা স্ট্রীটে ২০০ বছরের পুরানো রাধাগোবিন্দ জিউ মন্দিরটি দখল করার চেষ্টা করেছে জমিমাফিয়া হাজি ইসলাম উদ্দীন, হাজি আফজল হোসেন এবং ৭৭ নং ওয়ার্ডের আওয়ামী লীগ সভাপতি হাজি আবুল হোসেন আবুল। তারা ক্রমাগত মন্দির কর্তৃপক্ষকে হুমকি দিচ্ছে মন্দির বন্ধ করার জন্য। ঢাকার রমনা মডেল থানায় এই অভিযোগ জানিয়ে ডায়েরী করা হয়েছে। ডায়েরী নং ১৮৪১/২৮.০৩.২০১১।

২) ঢাকার রামপুরা এলাকায় প্রায় ২২৫ ঘর হিন্দু বসবাস করে। সেখানে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মন্দিরের পিছনে হিন্দুদের শ্মশানস্থানের তিন চতুর্থাংশ জমি দখল করে নিয়েছে জনৈক রাজউক আলি। এখন সে মন্দিরটা দখল করার চেষ্টা করছে। স্থানীয় হিন্দুরা এই ভূমি দখল জেহাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে দৃঢ় সংকল্প।

৩) মানিকগঞ্জ শহরের পাশে উরাকিয়া নামক স্থানে গোলক মন্ডল ও শরৎ মন্ডলকে তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করতে একটি হিন্দু মন্দির ভেঙ্গে দেয় আওয়ামী লীগের এম. পি. জাজিদ মালিক। অজুহাত সেখানে একটি হাসপাতাল তৈরী করা হবে।

[সূত্রঃ <**www.bengaliheart.com**>24May'11]

কারা করবে ধর্মের সংস্কার ? (৬)

তপন কুমার ঘোষ

ধর্ম বিষয়ে আলোচনা করতে হলে আর একটি বিষয়কে কোন ভাবেই বাদ দেওয়া যায় না। তা হল বাঙালির দুর্গাপূজা। সবাই একবাক্যে বলবে যে বাঙালির জীবনে সব থেকে বড় উৎসব হল দুর্গাপূজা। বাঙালি নয় এমন যে কেউ, ভারতীয় বা বিদেশী, একথা শুনে ভাববে যে বাঙালিরা কত ধার্মিক। কিন্তু সত্যিই কি তাই? ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের আগে একটা তুলনা করতে চাই। এটা ঠিক যে শতকরা ৮০-৯০ ভাগ বাঙালি হিন্দু দুর্গাপূজার উৎসবে কোন না কোনভাবে মেতে ওঠে। কলকাতা ও অন্য ছোটবড় শহরগুলিতে পূজার সময় ঠাকুর দেখার জন্য মানুষের স্রোত নয়, প্লাবন আমরা দেখি। এইবার একটু তুলনা করুন তো এই ভিড়ের সঙ্গে রেড রোডের ঈদের নামাজ পড়ার ভিড়ের। এই দুই ভিড়ের চরিত্রের মধ্যে, আচরণের মধ্যে, অ্যাটিচুডের মধ্যে কোন তফাৎ আছে, না নেই? দুর্গাপূজার ভিড়ের মধ্যে ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা, মা দুর্গার প্রতি ভক্তি কতটা দেখা যায়? আর ঈদের নমাজের ভিড়ে তাদের ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা ও আনুগত্যের প্রতিফলন কতটা দেখা যায়? এই দ্বিতীয়টা কি অনেক বেশী নয়? দেশের প্রত্যেক শহরে আছে ঈদগাহ্ ময়দান। আর ওই ময়দান ছাড়িয়েও তারা তো রাস্তা দখল করতে বেশী আগ্রহী। কিন্তু ময়দানই হোক আর রাস্তাই হোক, তার পাশে কতগুলো চাউমিন, পরোটার দোকান বসে? কতগুলো বেলুনওয়ালা আর ভেঁপুবাঁশিওয়ালা ঘুরে বেড়ায়? খুব বেশী নয়। কারণ, সেখানে মুসলমানরা তো চাউমিন খেতে যায় না, নামাজ পড়তে যায়। তাই চাউমিন, বাঁশি ভেঁপুর বিক্রি বেশী নয়। আর আমাদের পূজার ভিড়ে? বিশাল মেলা বসে যায়। তা নিয়ে আমরা গর্বও করি। তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু, ঠাকুর দেখার নাম করে যারা ঐ মেলায় যাচ্ছে, তাদের মধ্যে ভক্তি কই, নিষ্ঠা কই? যতটা টান মা দুর্গার প্রতি, তার থেকে বেশী টান চাউমিনের প্রতি। তার থেকেও বেশী টান মন্ডপ সজ্জার প্রতি। আর তার থেকেও বেশী টান স্মার্ট যুবক ও সুসজ্জিতা যুবতীদের পরস্পরের প্রতি। ঠাকুর দেখার সংখ্যা সারা বাংলায় লাখের অঙ্কে নয়, কোটির অঙ্কে যাবে। এই কোটি কোটি দর্শনার্থীদের মধ্যে ০.০০১ শতাংশও পূজোর সময় অঞ্জলি দেয় না। তাহলে বাঙালি হিন্দুর এই দুর্গাপূজায় মেতে ওঠা — এটা ভক্তি, নিষ্ঠা, না হুজুগ? এই হুজুগেপনা নিয়ে ঈদের নামাজে অংশগ্রহণকারীদের নিষ্ঠা, আস্থা, আনুগত্য আর সংকল্পে দৃঢ়তার সামনে টেকা যাবে কি?

হ্যাঁ, এটা স্বীকার করতে হবে যে বিশেষ বিশেষ তিথিতে দক্ষিণেশ্বর, কালীঘাট, ঠনঠনিয়া প্রভৃতি কালীমন্দিরে যে লম্বা লাইন পড়ে, তাতে হুজুগ নেই। আছে ভক্তি ও বিশ্বাস। কিন্তু সেখানে যে এত ভক্তি সহকারে মানুষ ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকছে সেখানেও তো উদ্দেশ্য ব্যক্তিস্বার্থ। এবং এতে কোন সামূহিক সংকল্প নেই, নেই কোন সামূহিক কামনা বাসনা। কিন্তু এই সামূহিক কামনাবাসনা আছে ঈদের নামাজে। তাই আমাদের মন্দির ভাঙ্গে, জবরদখল হয়, সরকারী অধিগ্রহণ হয়। আর ওরা নিজেদের মসজিদকে সুরক্ষিত রেখে জনগণের রাস্তার দখল নেয়। সুতরাং, দুর্গাপূজার রাত্রিগুলোর ওই লক্ষ কোটি মানুষের ভিড় প্রকৃতই হিন্দুধর্মের কোনরকম শক্তিবৃদ্ধি করে কিনা — এটা একটা বড় প্রশ্ন। এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার দায়িত্ব পাঠকদের উপরেই আমি চাপিয়ে দিচ্ছি।

দেবী দুর্গার অকালবোধন করেছিলেন শ্রীরামচন্দ্র। কেন করেছিলেন? রাবণবধের জন্য। দুর্গাপূজা তো আমরা করি। কিন্তু শ্রীরামের অনুসরণ আমরা করি কি? রামের জীবনবাণী দুর্গাপূজার হুজুগে ভক্তরা এতটুকুও বুঝতে পেরেছেন কি? আমাদের ধর্ম শুধু আধ্যাত্মিকতা নয়, শুধু দেবতায় ভক্তি নয়, হুজুগ তো নয়ই। আমাদের পবিত্র হিন্দু ধর্ম সমাজের সঙ্গে জড়িত, মানবতার সঙ্গে জড়িত, প্রকৃতির সঙ্গে জড়িত। বিশ্বে প্রথম গ্রন্থ যেমন ঋগ্বেদ, ঠিক তেমনি এই বিশ্বে দেশপ্রেমের প্রথম মন্ত্র উদগাতা শ্রীরাম। রাবণবধ ও লঙ্কা বিজয়ের পর অযোধ্যায় ফিরে আসার ব্যাপারে লক্ষ্মণের অনিচ্ছা শুনে রাম বলেছিলেন — জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। এই বাণীই হচ্ছে বন্দে মাতরম্ ধ্বনির বীজ বা পূর্বসূরী। যারা কম্যুনিষ্ট বা মার্কসবাদী, তারা ধর্ম মানে না, দেশকে ভালবাসে না, আমাদের মহাপুরুষ ও অবতারদেরকে অস্বীকার করে। তাই তাদের কথা বাদ। কিন্তু রামভক্তরা? যারা রামের পূজা করেন, রামনবমীতে উপবাস করেন আর মনে করেন যে শুধু রামের নাম নিলেই মহাপুণ্য, তারা কি রামের এই দেশভক্তির কথা আদৌ জানেন? জানলেও বোঝেন? আর বুঝলেও পালন করেন? সবগুলোরই উত্তর— না। সুতরাং, একথা স্পষ্ট যে রাম নাম করা রামভক্তদের থেকে আমাদের দেশপ্রেমিক স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপ্লবীরা অনেক বেশী রামভক্ত ছিলেন। তাঁরাই শ্রীরামের অধিক প্রিয়।

ধর্মের উপর আলোচনা এবার বোধহয় গোটানোর সময় হয়ে এসেছে। তাই সারসংক্ষেপ হিসাবে কয়েকটা কথা বলার চেষ্টা করি। আমাদের ধর্ম শুধু অনুষ্ঠানে নয়। ধর্মের মূল হল - প্রেরণা, আস্থা, নিষ্ঠা ও সংকল্প। একসময় আমাদের সমাজে চার বর্ণ, চার আশ্রম ও চার পুরুষার্থ ছিল। বর্তমানে প্রথম দুটি অনেকটাই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে। কিন্তু চার পুরুষার্থের (ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ) পালন সমানভাবে করতে হবে। সমাজে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি — কোনটারই যেন বাড়াবাড়ি না করা হয়। তিনটি মার্গকেই সমান গুরুত্ব দিয়ে সবাইকে স্বাধীনতা দিতে হবে ও উৎসাহ দিতে হবে নিজ নিজ প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি অনুসারে মার্গ বেছে নিতে। আমাদের ধর্মের অর্থ অত্যন্ত গূঢ় ও অত্যন্ত ব্যাপক। কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য অনিবার্য্যরূপে পালনীয় হল কর্তব্যধর্ম। তাই ভক্তি, নিষ্ঠা, জপ, তপ, পূজা, পাঠ, মোক্ষ ইত্যাদিতে বেশী জোর দিয়ে কর্তব্যে অবহেলা — কোনমতেই ধর্ম নয়। দেশ ও সমাজের সঙ্গে আমাদের ধর্ম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই দেশ ও সমাজের প্রতি নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন না করে কেউ ধার্মিক হতে পারে না। বর্তমানে দেশধর্ম ও সমাজধর্ম পালন করা একান্ত কর্তব্য। যার দ্বারা আমরা সংকুচিত হই, আমাদের দেশ ও সমাজ আয়তনে, সংখ্যায় ও সম্মানে ছোট হয় —তা অধর্ম। আর যা আমাদের দেশ ও সমাজকে আয়তনে সংখ্যায় ও সম্মানে বড় করে - তাই ধর্ম। নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম্। সুতরাং, ভারতের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া অংশগুলিকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করাটাই ধর্ম। অর্থাৎ অখণ্ড ভারত ধর্ম, খণ্ডিত ভারত অধর্ম। যা মানুষকে নিষ্ক্রিয় করে, জড় করে, ভীত করে - তা অধর্ম। যা মানুষকে সক্রিয় করে, সাহসী করে, শক্তিশালী করে - তা ধর্ম। রাজসিক গুণস স্পন্ন না হয়ে সাত্ত্বিক হওয়া যায় না। তাই সত্ত্বগুণের আগে রজোগুণ অর্জনের চেষ্টা করতে হবে। সমাজে ভেদাভেদ দূর করতে হবে। এটাই এখন যুগধর্ম। গুণ, যোগ্যতা ও কর্মের ভিত্তিতে কোন শ্রেণীকরণ হতে পারে। কিন্তু জন্মের ভিত্তিতে ছোট বড় নির্ধারিত হওয়া অধর্ম। এটা মেনে নেওয়া যাবে না। যেহেতু বর্ণপ্রথার আজ আর কোন স্থান নেই, তাই সকল কর্মে সকলের অধিকার দিতে হবে। ব্যক্তির যোগ্যতা থাকলে তার জন্ম বা শ্রেণী দিয়ে কোন প্রকার কর্ম থেকে তাকে বঞ্চিত করা যাবে না। সম্পূর্ণ সমাজকে করতে হবে স্বাভিমানী ও নিজ ধর্ম সংস্কৃতির প্রতি আস্থাবান। আর যুবসমাজকে করতে হবে বীর ধর্মে অনুপ্রাণিত। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন, দেশ সমাজ ও সংস্কৃতি রক্ষা ধর্মের সব থেকে বড় পরিচয়। *(সমাপ্ত)*

হুজুরের মাথায় হাতুড়ি মেরে শেফালি ইজ্জত বাঁচাল

তারপর শুরু হয়েছে হিন্দুর উপর প্রশাসনের গণ অত্যাচার

তারিখ ২রা জুন, সময় বেলা ১১টা। বনগাঁ থানার রামচন্দ্রপুর গ্রামের গরীব রাজমিস্ত্রির যোগাড়ে নেপাল তরফদার। তার স্ত্রী শেফালি তরফদার, বয়স ২৭ বছর, মাঠে গিয়েছিল ছাগল দড়ি দিয়ে বাঁধতে। এখন মাঠে কচি পাট। তাই ছাগলকে মাঠে বেঁধে না রাখলে পাট খেয়ে নষ্ট করে দেবে। শেফালি যখন ছাগল বাঁধছিল, তখন মাঠেই কাজ করছিল হুজুর আলি, বয়স ৪০ বছর, পিতা সিদ্দিক। বাড়ীতে তার বিবি বাচ্চা আছে। হুজুর চড়াও হল শেফালির উপর। তাকে জাপটে ধরে ধর্ষণ করার চেষ্টা করতে লাগল। শেফালি একটু সাহসী বৌ। সে সহজে নতি স্বীকার করল না। প্রাণপনে বাধা দিতে থাকল। কিন্তু হুজুর তখন লালসায় উন্মত্ত। তাই তার প্রচেষ্টা সে চালিয়ে যেতে থাকল। শেফালির জামা কাপড় ছিঁড়ে গেল। সে নিজেকে মুক্ত করতে না পেরে তার হাতের হাতুড়ি দিয়ে সজোরে মারল হুজুরের মাথায়। ছাগল বাঁধার খোঁটা পোতার জন্য শেফালির সঙ্গে হাতুড়ি ছিল। সেই আঘাতে হুজুরের কপাল ফুলে গেল। এবং সে শেফালিকে ছেড়ে দিল। ইতিমধ্যে চিৎকার চেঁচামেচিতে অনেক মুসলমান জড় হয়ে গিয়েছে। তারা শেফালিকে তাড়া করল। শেফালি জামা কাপড়া ছেঁড়া অবস্থায় দৌড়ে নিজের পাড়ার দিকে এল। তার অবস্থা দেখে পাড়ার হিন্দুরাও জড় হয়ে গিয়েছে। আশপাশের গ্রাম থেকে হিন্দু সংহতির ছেলেরাও এসে গেল। হিন্দুদের মারমূর্তি দেখে মুসলমানরা পালাল।

সমবেত হিন্দুরা বনগাঁ সুটিয়া রোডের উপর রামচন্দ্রপুর মোড়ে পথ অবরোধ করল। বনগাঁ থানা থেকে পুলিশের গাড়ী এল। অবরোধ তো উঠলই না বরং পুলিশের গাড়ীর উপর চড় চাপড় পড়তে লাগল। অপরাধীকে গ্রেপ্তার করার দাবী জানাল বিশেষ করে হিন্দুরা মহিলারা। কিন্তু এলাকার পরিস্থিতি দেখে হুজুর আলি তার বৌ বাচ্চা নিয়ে পালিয়েছে। দুঘন্টা পর রাস্তা অবরোধ উঠল। এই ঘটনায় এলাকার হিন্দুদের মধ্যে ঐক্যের পরিবেশ তৈরী হয়েছে। থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

৩ রা জুন পুলিশ হুজুরকে গ্রেফতার না করার প্রতিবাদে রামচন্দ্রপুরের গ্রামবাসীরা আবার রামচন্দ্রপুর মোড়ে অবরোধ শুরু করে। সেই সময় পুলিশ ভিড়ে গ্রামে যায় হুজুর আলির সন্ধানে। তখন ভিড়ে গ্রামের মুসলমানরা সেই পুলিশের গাড়ী ভাঙচুর করে। পুলিশ থানায় খবর দিলে থানা থেকে আরও পুলিশ বাহিনী আসে। তখন রামচন্দ্রপুর মোড়ে অবরোধ শেষ হয়ে লোকেরা রাস্তার যানজট পরিস্কার করছিল। পুলিশ ভুল করে ভাবে যে ওখানেই পুলিশের গাড়ী ভাঙচুর হয়েছে। তাই সেখানেই সাধারণ মানুষের উপর লাঠি চার্জ শুরু করে। এর ফলে স্থানীয় তৃণমূলের ঘাটবাওড় অঞ্চল প্রধানের (কাঞ্চন তরফদার) স্বামী গোবিন্দ তরফদার মারাত্মক ভাবে আহত হয়। তা দেখে সাধারণ মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে ও পুলিশের উপর ইঁট পাটকেল ছুঁড়তে শুরু করে। এতে চার জন পুলিশ আহত হয়, এদের মধ্যে দুই জনকে বনগাঁ হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। এই ঘটনার পর তৃণমূলের চক্রান্তে পুলিশ মোট ৫০ জন গ্রামবাসীকে গ্রেফতার করে শারীরিক অত্যাচার চালায়। এদের মধ্যে ২৭ জনকে পরেরদিন কোর্টে চালান করে ও বাকীদের ছেড়ে দেয়। ওই রাত থেকে রামচন্দ্রপুর, কালমেঘা, আঙ্গারপুকুরিয়া, নেতাজীনগর ও এড়োপোতা হিন্দুপ্রধান গ্রামে পুলিশ রেড করার নামে অত্যাচার চালানো শুরু করে। পাঁচটি গ্রামের হিন্দু পুরুষরা ভয়ে গ্রাম ছাড়া হয়। মহিলাদের উপর অত্যাচার চলতে থাকে। এলাকাগুলিতে পুলিশ ব্যাপক ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছে, ফলে হিন্দুরা এলাকা ছাড়ছে।

বড় পাহাড়ীতে হনুমান মন্দির ধ্বংস

বীরভূম জেলার রামপুরহাট থানার বড় পাহাড়ী নামক স্থানে একটি পতিত জমির উপর আদিবাসীরা একটা হনুমান মন্দির তৈরী করে নিয়মিত পূজা দেয়। গত ৩১ মে রাত্রে কে বা কারা ঐ মন্দিরটি পুড়িয়ে দেয়। এতে আদিবাসীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েছে। তারা ১ জুন দুমকা রোড অবরোধ করে এবং রামপুরহাট শহরে দোকান বাজার বন্ধ করে। ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। ২ রা জুন ঝাড়খন্ডের দুমকাতেও এই প্রতিবাদে পথ অবরোধ হয়েছে।

এই ছোট্ট ঘটনায় ক্ষোভ এতদূর ছড়ানোর একটি পৃষ্ঠভূমি আছে। এই এলাকায় প্রায় ৪০০ পাথরখাদান ও ১৫০০ পাথর ভাঙ্গা মেশিন আছে। এর অধিকাংশেরই মালিক মুসলমান। আর শ্রমিক স্থানীয় আদিবাসী ও মুর্শিদাবাদ থেকে মুসলিমরা। এইসমস্ত জমির আইনত মালিক এই আদিবাসীরাই। কিন্তু আইনের ফাঁকে এই জমিগুলোকেই লীজের নামে হড়প করে নিয়ে মালিকরা খাদান ও ক্রাশার চালিয়ে স্টোনচিপ বিক্রি করে কোটি কোটি টাকা কামাচ্ছে। আর গরীব শ্রমিকরা পাথরগুড়োর হাওয়ায় টিবি রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। তার উপর গরীব আদিবাসী রমণীদের উপর পড়েছে মালিকদের লালসার নজর। হচ্ছে তাদের যৌন শোষণ। আর ঐ মালিকরা পাচ্ছিল শাসক সিপিএমের ছত্রছায়া। বিনিময়ে পার্টি পাচ্ছিল ঐ মালিকদের কাছ থেকে পাথরকুচির লাভের টাকা। আর পুলিশ-প্রশাসন? তারাও বঞ্চিত হচ্ছিল না। সুতরাং, মরছিল আদিবাসীরা, লুট হচ্ছিল তাদের মেয়েদের ইজ্জত। সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে আদিবাসীরা ফেটে পড়ল ক্রোধে। পুড়ল অনেক ক্রাশার। বন্ধ হল সমস্ত খাদান ও ক্রাশার। খুন হল একজন ধর্ষণকারী মুসলমান মালিক। মুসলিম মালিক ও মুর্শিদাবাদের শ্রমিকরা এক হয়ে আক্রমণ করল, পুড়িয়ে দিল আদিবাসী গ্রাম। ফেল হয়ে গেল মার্কসের শ্রেণী তত্ত্ব। ধর্মের ভিত্তিতে মিলে গেল মালিক ও শ্রমিক। তাদের যৌথ আক্রমণের মুখে পড়ে বহু গ্রাম শূন্য করে আদিবাসীরা, বিশেষ করে মেয়েরা পালাতে বাধ্য হল। গ্রাম রক্ষার দায়িত্ব নিল আদিবাসী গাঁওতা নামে সংস্থা। আদিবাসীদের আর কোন সংস্থাকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

তখন থেকে গোটা বীরভূম জেলাতে আদিবাসী ও মুসলমানদের মধ্যে প্রচন্ড উত্তেজনা চলছে। এরকম একটা পরিস্থিতিতে বড়পাহাড়ীতে আদিবাসীদের তৈরী হনুমান মন্দির পোড়ানোর ঘটনায় ওই খাদান ও ক্রাশার মালিকদের দিকেই সন্দেহের তীর যাচ্ছে। তাই আদিবাসীদের এই ক্ষোভ বিক্ষোভ শুধু মন্দির পোড়ানোর জন্য নয়। অনেক পুরানো ক্ষোভের বহিঃ প্রকাশ। পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসন আদিবাসীদের রক্ষা ও তাদের মহিলাদের সম্ভ্রম রক্ষায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হওয়ায় ঝাড়খন্ডের আদিবাসীরা তাদের সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছে।

পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ কী চায় ?

পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ নাকি খুব ভাল। শুধু তাদের দেশের রাজনৈতিক নেতারা আর মিলিটারির জেনারেলরা বদমাস। তারাই নিজেদের স্বার্থে ভারতের সঙ্গে অশান্তি জিইয়ে রেখেছে। সদ্য পাকিস্তানে একটি জনমত সমীক্ষা হয়েছে। তাতে সেখানকার সাধারণ মানুষের চিন্তাভাবনা ফুটে উঠেছে।

গত জানুয়ারী মাসে (২০১১) গিলানী রিসার্চ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে 'গ্যালপ্ পাকিস্তান' নামক জনমত সমীক্ষাকারী সংস্থা পাকিস্তানের চারটি প্রদেশে বড় আকারে একটি জনমত সমীক্ষা করে। ২৭৩৮ জন পুরুষ ও নারীর উপর চালানো এই সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে যে পাকিস্তানের ৬৭ শতাংশ মানুষ চায় সেখানকার সমাজকে ইসলামীকরণ করার জন্য সরকারের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। অর্থাৎ সেখানকার দুই তৃতীয়াংশেরও বেশী মানুষ চায় যে সরকারী উদ্যোগে সমাজের ইসলামীকরণ হোক। ২০ শতাংশ মানুষ কোন মতামত প্রকাশ করেনি, আর মাত্র ১৩ শতাংশ মানুষ বলেছে যে সমাজের ইসলামীকরণের কোন প্রয়োজন নেই। যারা ইসলামীকরণ চায় তাদের মধ্যে ৩১ শতাংশের মত, এক ধাক্কায় এই ইসলামীকরণ সম্পন্ন করা হোক, ৪৮ শতাংশের মত— একসঙ্গে নয়, একটি একটি করে পদক্ষেপ নিয়ে ইসলামীকরণ করা হোক। আর ২১ শতাংশ এ বিষয়ে মনস্থির করতে পারেনি।

সুতরাং একথা স্পষ্ট যে পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ শুধু ধর্মীয় রাষ্ট্র নিয়ে সন্তুষ্ট নয়, তারা ইসলামিক সমাজব্যবস্থা চায়, ইসলামিক সমাজব্যবস্থায় ধর্মনিরপেক্ষতার স্থান কতটা তা ইরাক, ইরান, সৌদি আরবের দিকে দেখলেই বোঝা যায়। সুতরাং, মহান ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের জন্য পাকিস্তান ও ওইসব দেশে ফাঁকা ময়দান পড়ে আছে, তবুও ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা সেখানে যাওয়ার কথা একবার মুখেও আনেন না কেন তা বোঝা দায়। এদেরকে পাকিস্তান ও মিডল ইস্টে রপ্তানি করতে পারলে এদেশটা বাঁচত।

বারুইপুরে সিপিএম করার অপরাধে বাগদিরা আক্রান্ত

বারুইপুরের বিরাট মাপের সি.পি.এম. নেতা সুজন চক্রবর্ত্তী। যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন সাংসদ। বারুইপুরের পাশে রামনগর ১ নং পাঞ্চায়েতে শশাড়ি বটতলার কাছে বাগদিপাড়ায় ৫০ ঘর হিন্দুর বাস। তারা সিপিএম করে। পাশেই কাজিরাবাদ মুসলিম পাড়া। বেশিরভাগ মুসলমানই তৃণমূল হয়ে গিয়েছে। কিছু মুসলমান এখনও সিপিএম আছে।

১৩ মে নির্বাচনের ফল বের হওয়ার পরই রাত্রে মুসলমানরা বাগদিপাড়া আক্রমণ করল। তাদের অপরাধ - তারা সিপিএম করে। নিশিকান্ত সরদার, সত্য সরদার, মোহন্ত মন্ডল, মাগুর মন্ডলের বাড়ি ভাঙচুর হল। বাড়ির লোক মার খেল। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, হামলায় নেতৃত্ব দেয় কাজিরাবাদের সাইফুল মন্ডল, ইউনুস সরদার, রফিক সরদার ও কাহার সরদার- অঞ্চলের তৃণমূল উপপ্রধান। অত্যাচারে পুরুষমানুষরা পালিয়ে মাঠে রাত কাটাল। পরদিন সকালে উক্ত কাহার আলি বাগদিপাড়ায় এসে বলল, গতকাল রাতে যা হয়েছে তার জন্য দুঃখিত। আর এরকম হবে না। সকলে যেন নিশ্চিন্তে বাড়ীতে থাকে। সবাই ভরসা পেয়ে বাড়িতে থাকল। ১৪ ই মে রাত্রি ১১ টার সময় মুসলিমরা আবার পাড়া আক্রমণ করে প্রচন্ড অত্যাচার করল। তখন গ্রামের কিছু মানুষ একত্রিত হয়ে ওই রাত্রেই পাশের গ্রাম শশাড়িতে তৃণমূলের অঞ্চলপ্রধান শ্রীমতি শেফালি সরদারের বাড়ি গেল। শেফালি দেবী অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে ঘুম থেকে উঠলেন। তাদের কাছে ঘটনার বিবরণ শুনে তখনই ফোনে কাহার সরদারকে ডাকলেন। কাহার ফোনে বলল, 'আমি তো বাড়িতে ঘুমাচ্ছি'। শেফালিদেবী বললেন, 'আমার বাড়িতে কাঁড়ি লোক জমা হয়েছে। বলছে তাদের উপর অত্যাচার হয়েছে। তুমি এখনই এস'। কাহার সরদার এলে তিনি বললেন, 'দেখ, এই এক কাঁড়ি লোক জমা হয়েছে, বলছে যে তোমরা নাকি ওদের বাগদিপাড়া আক্রমণ করে ওদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছ'। এই শুনে কাহার ধমক দিয়ে ওই বাগদিদেরকে বলল, 'কেউ দেখেছে যে আমি ছিলাম'? বাগদিরা ভয়ে ভয়ে বলল যে তারাই দেখেছে। তখন কাহার আরও জোরে ধমক দিয়ে বলল, কেউ আমাকে চিনতে পেরেছে? কেউপ্রমাণ দিতে পারবে? তার এই মারমুখী মূর্তি দেখে বাগদিরা বুঝতে পারল যে শেফালিদেবী তাদেরকে আরও বিপদে ফেলে দিচ্ছেন। তারা চুপচাপ চলে গেল। মাঠে রাত কাটিয়ে পরদিন ভোরের প্রথম বাস ধরে প্রায় ২০ জন বাগদি দূরে আত্মীয় বাড়ি চলে গেল। থানায় অভিযোগ করার ক্ষমতা তাদের নেই। কারণ পুলিশকে দলের ক্রীতদাসত্ব করার শিক্ষা সিপিএম-ই দিয়েছে। এখন পুলিশ তৃণমূলের দাসত্ব করবে। তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ নেবে না।

এখানে উল্লেখ্য যে, সিপিএম করার অপরাধে গরিব বাগদিদের উপর চরম অত্যাচার হলেও কাজিরাবাদ গ্রামেই সিপিএম নেতা আব্দুল খালেক ঢালি (প্রাক্তন প্রধান), আমীর আলি মন্ডল, ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী ও মোক্তার তরফদারের বাড়ির উপর কোন হামলা হয়নি। যখন অত্যাচারিত বাগদিদেরকে জিজ্ঞাসা করা হল যে তারা কাছেই বারুইপুরে সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্ত্তীর কাছে যায়নি কেন? তারা উত্তর জানাল যে সুজনদা এখন ডবল গ্রীলে ডবল তালা লাগিয়ে ভিতরে বসে আছেন। তিনি আমাদের কি রক্ষা করবেন?

জামদানী গ্রামের হিন্দুর করুণ আবেদন

হিন্দু সংহতির কার্যালয়ে বহু মানুষ আসেন তাদের সমস্যা নিয়ে, অনেক রকমের আবেদনপত্রও জমা পড়ে। এরকম একটি ক্ষুদ্র আবেদনপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত থানায় দায়ের করা সত্যনারায়ণ প্রধানের ২০১০ সালের ২৫ শে জুলাই তারিখের অভিযোগ পত্রটি এই পত্রিকায় তুলে ধরা হচ্ছে। ব্যাখার প্রয়োজন নেই।

To The Officer-in-Charge
Gaighata P.S., (N) 24 Pgs.
Sir,

আমার বিনীত নিবেদন এই যে আমি সত্যনারায়ণ প্রধান, ২ নং ইছাপুর অঞ্চলের জামদানী গ্রামের বাসিন্দা, আমি ১৯৬৪ সালে বিনিময় প্রথার মাধ্যমে এই গ্রামে এসে বসবাস শুরু করি। আমার বাড়ির চৌহদ্দির ভিতরে ৪৩৬/১১২১ দাগে একটি পুরানো জীর্ণ মসজিদ আছে। মসজিদটি আমার নামে রেজিস্ট্রাড (Registered)। আমার বসতবাড়ির চারিদিকে হিন্দু সম্প্রদায়ের বাস। পূর্বে ২০-২৫ টি পরিবারের মুসলিমরা তাদের ধর্মীয় কার্যকলাপ এই মসজিদে পালন করত। প্রায় দশবছর পূর্বে তারা আকস্মিক ভাবে তারা অন্যস্থানে একটি মসজিদ তৈরী করে। সেখানে তারা নিয়মিত আজান দিয়ে থাকে। সেই সময় নতুন মসজিদ নির্মাণের কারণ হিসাবে হিন্দুপাড়া সংলগ্ন মসজিদের উজির (?) নিয়েছিলেন এবং তখন আমাকে বলা হয় নতুন মসজিদ নির্মাণ হেতু, আমার বসত বাড়ি সংলগ্ন মসজিদ পুনরায় সংস্কার করা হবে না বা ভবিষ্যতে ব্যবহার করা হবে না। কিন্তু হঠাৎ কিছুদিন পূর্বে এই গ্রামের বাসিন্দা আনারুল মন্ডলের নেতৃত্বে এই মসজিদের সংস্কারের কাজ শুরু হলে আমি বাধাদান করি। আমি তাদের বলি, যদি আইনসঙ্গত ভাবে তারা এই মসজিদের অধিকারী হয়, তবে তারা সংস্কার করতে পারে। আমি বিভিন্ন বার্ধক্য জনিত রোগে আক্রান্ত এবং প্রায়ই মুমুর্ষ হয়ে পড়ি। আমি আমার জীবিত অবস্থায় এই সমস্যার সমাধান দেখে যাওয়ার আশা করি।

আপনার কাছে আমি একান্ত অনুরোধ করি, আপনি সরেজমিন তদন্ত করে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা নিয়ে আমার নিরাপত্তাহীনতা দূর করুন। আপনি আমার সমগ্র সমস্যা আন্তরিকভাবে বিবেচনা করলে আমি বাধিত থাকিব। ইতি —

২৫.০৭.২০১০ শ্রী সত্যনারায়ণ প্রধান

এই অভিযোগ পাওয়ার পরেও যথারীতি থানা কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। সেই কারণেই অভিযোগকারীরা হিন্দু সংহতি দপ্তরে আবেদন করেন। বর্তমানে সত্যনারায়ণ প্রধানের বাড়ীর চৌহদ্দীর ভিতরে মুসলিমরা প্রতি শুক্রবারে নামাজ পড়ার অজুহাতে ঢুকছে। উনি কোনভাবেই আটকাতে পারছেন না। গ্রামের অন্য হিন্দুরাও ভয়ে ওনার পাশে এসে দাঁড়াতে পারছে না। রাজনৈতিক নেতাদের কাছে যাওয়া তো বৃথা। তাদের কাছে মুসলমানের ধর্মাচরণ, নামাজ পড়া — এসব তো প্রচন্ড পবিত্র। তা আপনার বাড়ীর ভিতরে হলেও । এ তো তাদের পবিত্র সংখ্যালঘুর অধিকার। এ অধিকার তো রক্ষা করতেই হবে। তা আপনার বাড়ীর ভিতরে হলেও, বা আপনার পাড়ার ভিতরে হলেও। কিন্তু একটি মুসলিম পাড়ায় একটি হিন্দু মন্দিরে যদি কাঁসরঘন্টা বাজিয়ে পূজা চলে, আর যদি মুসলিমরা এসে বাধা দেয়, তখন নেতা ও প্রশাসন উভয়েই ধমক দিয়ে বলবে, কাঁসরঘন্টা বন্ধ কর, মসজিদের পাশ দিয়ে শবযাত্রা নিয়ে যাবার সময় হরিধ্বনি বন্ধ কর। এই কয়েকদিন আগেও দঃদিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ থানার রামকৃষ্ণপুর অঞ্চলের বিশ্বনাথপুর গ্রামে মতুয়া সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ ডাংকা বাজিয়ে হরিধ্বনি দিতে দিতে একটি শবদেহ নিয়ে যাচ্ছিল শ্মশানে। একটি মসজিদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তারা ডাংকা বন্ধ করে যাচ্ছিল। তা সত্বেও তাদের উপর আক্রমণ হয় এবং থান ইটের আঘাতে গুরুতর আহত হয়ে শবযাত্রায় অংশগ্রহণকারী এক মহিলাকে স্থানীয় বরহড় হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়।

গোবরডাঙ্গার নিকট জামদানী গ্রামের সত্যনারায়ণ প্রধানের বাড়ীর ভিতর মুসলিমদের এই অবৈধ অনুপ্রবেশের ফলে হয়ত শেষ পর্যন্ত তাঁকে বাড়ী বিক্রি করে দিয়ে চলে যেতে হবে। এবং এই পরিস্থিতি দেখে কোনো হিন্দু তা কিনতে এগিয়ে আসবে না। ফলে মুসলিমরাই জলের দামে ওই বাড়ী কিনে নেবে। মসজিদ, মাজার, ওয়াকফ সম্পত্তির অজুহাতে সম্পূর্ণ হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় মুসলমানদের ঢোকার প্রচেষ্টা সর্বত্র চলছে এবং তা সফলও হচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলি এই কাজে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করে হিন্দুর সর্বনাশের পথ পাকা করে দিচ্ছেন। এই পত্রিকার পাঠকদের মনে আছে, বারাকপুর শহরে ৩ নং ওয়ার্ডে সিপিএমের দোর্দন্ডপ্রতাপ প্রাক্তন এম.পি. তড়িৎ তোপদার কিভাবে নিজের ওয়ার্ডেই হিন্দুদের হুমকি দিয়ে ৬০ বছরের অব্যবহৃত ভাঙ্গা মসজিদে মুসলমানদের নামাজ পড়তে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। অথচ ওই ওয়ার্ডে একজনও মুসলিমের বসবাস নেই। বারাকপুর রেল লাইনের ধারে ওই ভাঙ্গা মসজিদ আজ নতুন হয়ে গিয়েছে। শুধু নামাজ পড়া নয়, সেখানে আজ মুসলিমদের স্থায়ী বাস। আর তড়িৎ তোপদারের তোপ শেষ হয়ে গিয়ে তিনি আজ গর্তের ভিতরে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে মুসলমানের তাড়া খেয়ে হিন্দুপ্রধান পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়ে তড়িৎ তোপদার হিন্দুদেরকে ভালই প্রতিদান দিয়ে গেলেন। তাঁরই স্ত্রী ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার।

অনুরূপভাবে কলকাতার পার্ক সার্কাস এলাকায় গোবরাতেও হিন্দু পাড়ায় বাচ্চাদের খেলার মাঠ দখল করে মুসলমানরা পাঁচিল দিয়ে দিয়েছে। পুলিশ পাহারা দিচ্ছে। এরকম ঘটনা পশ্চিমবঙ্গে বহু ঘটছে। গোবরডাঙ্গার পাশে জামদানী গ্রামের ঘটনা তারই নবতম সংস্করণ।

স্বামী রামদেবজীর আন্দোলন

শ্রদ্ধেয় স্বামী রামদেবজীর আন্দোলনে হিন্দু সংহতি র পরিপূর্ণ সমর্থন আছে। দিল্লীতে রামলীলা ময়দানে ৪জুন মধ্যরাত্রে শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহীদের উপর সোনিয়া গান্ধী সরকারের বর্বর অত্যাচার ভারতের গণতন্ত্রকে কলঙ্কিত করেছে। নেহেরু পরিবারের এই স্বৈরতন্ত্রী মনোভাবের সঙ্গে দেশ আগে থেকেই পরিচিত। দুর্নীতি ও বিদেশে জমা ভারতের অগাধ কালো টাকা দেশে ফিরিয়ে আনার আন্দোলনকে নষ্ট করার জন্যই কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের এই মধ্যরাতের বর্বর অত্যাচার। হিন্দু সংহতি এর তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছে। এর প্রতিবাদে যে কোন অরাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য হিন্দু সংহতি সকল কর্মী ও জনসাধারণকে আহ্বান জানাচ্ছে।

বিশেষ ঘোষণা ঃ এই পত্রিকা পড়ে যদি কেউ 'হিন্দু সংহতির' সঙ্গে যোগাযোগ করতে চান, তাহলে তিনি এই সংগঠনের কার্যালয় ঃ ৫ নং ভুবন ধর লেন, কলকাতা - ১২ (শিয়ালদহের নিকট শ্রদ্ধানন্দ পার্কের সামনে) **ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন। ফোন নং ঃ ০৩৩-২২৫৭২৬৮৮ এবং ৯৪৩৩৪ ৫৩১০৯।**

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি <www.hindusamhati.org>, <www.hindusamhatitv.blogspot.com>, <southasiasambad.blogspot.com>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006, Published at : 303/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Pargans, Editor's Name & Address Chittaranjan Dey, Vill. Domjur, Near Hospital, P.O. & P.S. Domjur, Howrah, Pin - 700 405